খসড়া অবস্থানপত্র

আমরা চাই সরকার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য দ্রুত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক

বাংলাদেশে মৎস্য খাতকে এগিয়ে নিতে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরাদ্দ বৃদ্ধি করুন

ভূমিকা:

বাংলাদেশের মৎস্য খাত, খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশকে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৬০% ক্ষুদ্র মৎস্য খাত থেকেই আসে এবং এই খাত প্রায় ২ কোটি মানুষের জীবিকার উৎস। এই অবদান সত্ত্বেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে সম্পদে সীমিত প্রবেশাধিকার, প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, আইনি ও নীতিগত সুরক্ষার অভাব, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ যখন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিশেষ করে এসডিজি ১ (দারিদ্র্য দূরীকরণ) এবং এসডিজি ১৪ (জলজ জীবনের সংরক্ষণ) অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার এবং একইসাথে তাদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ, যেহেতু সমুদ্র বিষয়ক জাতিসংঘের কনভেনশন (UNCLOS) এবং ফাও-এর টেকসই ক্ষুদ্র মৎস্য আহরণ নিরাপদ করার জন্য স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা (SSF Guidelines)-এর মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির স্বাক্ষরকারী একটি দেশ, তাই জাতীয় নীতি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্ষুদ্র জেলে মৎস্যজীবীদের স্বার্থ উন্নীত করার একটি সুযোগ আমাদের কাছে রয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশের জিডিপির মোট ৩.৫% আসে ক্ষুদ্র মৎস্য খাত থেকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৪৪.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়েছে। জাতীয় মৎস্য নীতি এবং সামুদ্রিক মৎস্য আইন এই খাতকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তবে এসব নীতিমালা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য নিরাপদ অধিকার, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়।

এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাগুলো বিশেষ করে মাছকে ঘিরে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঝড় বা সাইক্লোনের কারণে মাছ ধরার নৌকাগুলো আশানুরূপ মাছ ধরতে পারছে না। তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত মাছ ধরা ও ক্ষতিকারক পদ্ধতি ব্যবহার করার কারণে মাছের পরিমাণ আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে। ফলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা প্রায়শই দূরবর্তী ও বিপদজনক এলাকায় যেতে বাধ্য হন, যা তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তার উপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আইন মেনে চলাও স্থানীয় মৎস্যজীবীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, মূল্য সংযোজন এবং সরকারি মজুদ নীতিমালা নিম্ন-আয়ের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলছে এবং ডব্লিউটিওর আইন অনুযায়ী ভর্তুকি সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র মৎস্য খাতকে উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ প্রয়োজন তা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আমাদেরকে এই ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা রক্ষায় ন্যায়সঙ্গত নীতিমালা প্রণয়ন নিশ্চিত করার জন্য একসাথে কাজ করতে হবে।

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:

সম্পদের মালিকানায় সীমিত অধিকার এবং অতিরিক্ত মাছ শিকার

বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদের প্রায় ৯০% ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায় দ্বারা আহরিত হয়। তবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলার ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রতিযোগিতার কারণে বেশিরভাগ সময়ই এই ট্রলারগুলো ২০ নটিক্যাল মাইল (প্রায় ৩৭ কিমি) উপকূলের কাছাকাছি চলে আসে। যা ক্ষুদ্র মেৎস্যজীবীদের মাছ না পাওয়ার অন্যতম কারণ।

এর ফলে বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনে ২০-৩০% হ্রাস দেখা যাচ্ছে, যা উপকূলীয় এই ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায়ের আয় এবং খাদ্য নিরাপত্তার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির অতিমাছ শিকারের কারণে মাছের মজুদও হ্রাস পাচ্ছে, যা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য অর্থনৈতিক ও সম্পদগত ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছে।

মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময়ে আয়ের সীমিত সুযোগঃ

নিষিদ্ধ মৌসুমে জেলেরা প্রকট অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন। ২০২২ সালে কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, নিষিদ্ধ সময়কালে ২৩.৩% মৎস্যজীবী পরিবার মাসে ৫,০০০ টাকার কম আয় করেন এবং ৬০.৮% এর কোনো আয় থাকে না।

ফলে, ৭৯.৯% উচ্চ সুদের হারে ঋণ নিতে বাধ্য হন, যা নারীদের প্রতি সহিংসতার হার ৫১.৮% এবং মানসিক চাপ ৬৭.৪% পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। নিষেধাজ্ঞার কারণে খাদ্য নিরাপত্তা আরো তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেখানে আগে ৯৫% পরিবার দিনে তিনবার খাবার খেতে পারত, এখন তা ৫১% পরিবারে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

খাদ্য সাহায্য দেরীতে পৌঁছানো এবং অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণেও ক্ষুদ্র জেলে পরিবারে নেতিবাচক প্রভাব আরও বেড়েই চলেছে; জরিপে দেখা গেছে, ৫১.৫% পরিবার দেরিতে সহায়তা পেয়েছে

এবং ৯৪.১% পরিবারের জন্য তা অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়েছে। জরিপে আরও পাওয়া গেছে, ৬৩% নারী মৎস্যশ্রমিকরা (পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭০০-১০০০ টাকা এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৪০০-৫০০ টাকা) পুরুষদের চেয়ে একই কাজের জন্য কম আয় করেন।

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সমন্বয়ের অভাব:
বাংলাদেশে জেলেদের প্রতি বছর মোট ৮৭ দিন সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে, যা বিভিন্ন সময়কালে বিভক্ত। ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিনের নিষেধাজ্ঞা এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আরও ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

অন্যদিকে, ভারতে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত থাকে। ফলে, ভারতীয় জেলেরা ১৫ জুন থেকে মাছ ধরার সুযোগ পান, কিন্তু বাংলাদেশের জেলেরা ২৪ জুলাই থেকে মাছ ধরা শুরু করতে পারেন। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞার সময় ভারতে এ ধরনের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

এর ফলে, ভারতীয় জেলেরা বেশি সময় মাছ ধরার সুযোগ পান। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে ভারতীয় জেলেরা বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করে মাছ শিকার করেন। যখন বাংলাদেশের জেলেরা মাছ ধরার অনুমতি পান, তখন তারা তুলনামূলক কম মাছ পান।

পরিবেশগত অবক্ষয় এবং আবাসস্থল হ্রাস:
শিল্প সম্প্রসারণ, চিংড়ি চাষ এবং পর্যটনের নামে ভূমি/খাস জমি দখলের কারণে দূষণ বাড়ছে, যার ফলশ্রুতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন ও নার্সারি আবাসস্থলগুলোর ধ্বংস হচ্ছে। এই ইকো-আবাসস্থলগুলোর ক্ষতি, প্রাকৃতিক প্রজনন চক্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এবং মাছের জীববৈচিত্র্য হ্রাস করছে, যার ফলে অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ অত্যধিক ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

প্রয়োজনীয় আশু হস্তক্ষেপ ছাড়া, এই অবক্ষয় বাংলাদেশের জলাশয়গুলোতে মাছের মজুদ ও জীববৈচিত্র্য এর দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বকে অত্যাধিক হুমকির মুখে ফেলছে।

মৎস্য আহরণ পরবর্তী এবং মূল্য শৃঙ্খল সম্পর্কিত সমস্যা:
ক্ষুদ্র জেলেরা প্রায়ই তারা যে মাছ ধরেন, সেগুলো পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার অভাবে ভোগেন, যার ফলে তাদের পণ্যের গুণগত মান এবং লাভ কমে যায়। ফলে স্বল্প মূল্যে জেলেরা মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে তাদের মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হন।

পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব তাদের দারিদ্র্যকে আর প্রভাবিত করে, কারণ জেলেরা বাজারে তাদের পণ্যের সঠিক মূল্য গ্রহণ করতে অক্ষম হন।

জলবায়ু ঝুঁকিঃ
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধি এবং মাছ ধরার সময়ের পরিবর্তন। এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষুদ্র জেলেরা টেকসই মাছ ধরার এলাকাগুলোর সন্ধানে সমুদ্রের আরও গভীরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, যা তাদের জ্বালানির খরচ এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি উভয়ই বাড়িয়ে দেয়। জলবায়ুর অনিশ্চয়তা মাছ ধরার যে চিরাচরিত সময়সূচি তাকে ব্যাহত করছে এবং এই সম্প্রদায়গুলোর আয় অস্থিতিশীল করে তুলছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নির্ভরতাঃ
বাংলাদেশে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে ৭০% এরও বেশি পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে এবং তাদের আনুষ্ঠানিক ঋণ ও ব্যাংকিং সেবার প্রবেশাধিকারের সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই অনেক মৎস্যজীবী উচ্চ সুদের হারের জন্য অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতাদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন, যা তাদের ঋণ নির্ভরতা এবং আর্থিক দুর্বলতাকে বা বিপদগ্রস্থতাকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে তোলে।

উচ্চ ঋণের সুদ মৎস্যজীবীদের নৌকা, জাল ও সংরক্ষণ সরঞ্জামের মতো প্রয়োজনীয় মৎস্য সরঞ্জামে বিনিয়োগ করতে বাঁধা দেয়, যা তাদের দারিদ্র্যের চক্রকে আরও দীর্ঘায়িত করে।

অপর্যাপ্ত আইনি এবং নীতিগত সুরক্ষাঃ
জাতীয় জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সত্ত্বেও, ক্ষুদ্র জেলে সম্প্রদায় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত থাকে, যেখানে সরকার পরিচালিত মৎস্য নীতি আলোচনায় তাদের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। এই অন্তর্ভুক্তির অভাবের ফলে নীতিমালাগুলি ক্ষুদ্র জেলেদের চাহিদা যেমন নিরাপদ অধিকার, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সংরক্ষণ-এসব বিবেচনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অপর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষা ক্ষুদ্র জেলেদের বৃহত্তর বাণিজ্যিক খাত দ্বারা শোষণের ঝুঁকিতে ফেলে, যা তাদের ঐতিহ্যগতভাবে মাছ ধরার স্থানগুলোকে সঠিকভাবে বজায় রাখা এবং ব্যবস্থাপনা করার ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন করে।

মৎস্য, সামুদ্রিক মৎস্য খাত, সুনীল অর্থনীতি এবং ভর্তুকিঃ
২০১৮ সালে উন্নত দেশগুলো তাদের সামুদ্রিক মৎস্য খাতে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি প্রদান করেছিল, যার মধ্যে ক্ষুদ্র জেলেরা পেয়েছে মাত্র ১৯% এবং ৮০% গিয়েছে বৃহৎ কর্পোরেট মৎস্য কোম্পানিগুলোর কাছে। এই এক বছরে এই ভর্তুকির অধীনে তারা শুধুমাত্র তেলের পেছনেই ৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। অন্যদিকে, তারা এখন উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে মৎস্য খাতে ভর্তুকি দেওয়া নিরুৎসাহিত করছে। তাদের মতে, এই ভর্তুকিগুলো মাছের সম্পদ কমাতে ভূমিকা রাখবে এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সাংঘর্ষিক হবে। মৎস্য খাতের উন্নয়নে পৌঁছানোর পর তারা এখন উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এই পথে বাধা দিচ্ছে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিকল্প চাহিদা মেটাতে তারা আগ্রহী নয়।

বাংলাদেশকে সমুদ্রের মাছ সংরক্ষণের জন্য বৈশ্বিক চাপের মুখে সামুদ্রিক মৎস্য খাতে ভর্তুকি না দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে, যখন দেশের মাছ উৎপাদনের মাত্র ১৭% সমুদ্র থেকে আসে।

দক্ষতার অভাব এবং আধুনিক মৎস্য প্রযুক্তিতে সীমিত প্রবেশাধিকারঃ

অনেক ক্ষুদ্র জেলে বিশেষত নদী এলাকা জুড়ে মাছ ধরার পুরনো পদ্ধতি এবং অযান্ত্রিক নৌকা ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল, যা প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে কারণে ঘটছে। এই নির্ভরতাই বাজারে তাদের কার্যকারিতা এবং প্রতিযোগিতার ক্ষমতা সীমিত করে, যেখানে ক্রমবর্ধমানভাবে শিল্পকেন্দ্রিক মৎস্যশিল্প আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক ও কার্যকরী মাছ ধরার প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অভাব, জেলেদের বেশি আয়ের সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিচ্ছে এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশগত ও পারিপার্শিক অবস্থার সাথে তাদের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতাও কমিয়ে দিচ্ছে।

আমাদের সুপারিশসমূহঃ

১) মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলেদের পরিবারগুলোর মৌলিক চাহিদা মেটাতে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৬০ কেজি চাল এবং ৮,০০০ টাকা নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করতে হবে। এটি নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ে জেলে সম্প্রদায়ের আর্থিক চাপে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে অব্যাহত সহায়তা নিশ্চিত করবে।

২) সরকারের সহায়তা কর্মসূচির জন্য জেলেদের তালিকা পুনর্বিবেচনা করতে হবে, যেখানে যোগ্য নয় এমন প্রাপকদের সনাক্ত করা হবে এবং প্রকৃত জেলে পরিবারগুলোকে যারা সাহায্যের প্রয়োজন তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩) ছোট পরিসরের জেলেদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়ক প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হবে। এসব প্রকল্পের মধ্যে থাকতে পারে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, টেকসই মাছ ধরার চর্চা এবং অতিরিক্ত জীবিকা অর্জনের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) জেলেদের জন্য কর্মসংস্থান এবং বিশেষত নারী জেলেদের মাছ প্রক্রিয়াকরণ, শুকানো এবং বিপণনের জন্য স্বল্পসুদে ঋণ ও অনুদান প্রদান করুন।

৫) ক্ষুদ্র জেলেদের জন্য আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণদাতাদের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে এবং আর্থিক সহনশীলতা বাড়াবে। সুতরাং তাদের জন্য এই সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড থেকে জেলেদের কল্যাণের জন্য তহবিল বরাদ্দ করতে হবে।

৭) সাশ্রয়ী মূল্যে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। যা, জেলেদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম, টেকসই প্রযুক্তি ও আয়ের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে।

৮) খুব ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়গুলোকে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখতে হবে।

৯) ছোট পরিসরের জেলেদের সুরক্ষার জন্য উপকূল থেকে ২০ নটিক্যাল মাইল (৩৭ কিমি) পর্যন্ত বড় মাছ ধরার ট্রলারগুলোর জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।

১০) স্থানীয় জেলেদের স্বার্থ রক্ষায় এবং নিষেধাজ্ঞার সময়ে ও ঠিক আগে বিদেশি জাহাজ যাতে বাংলাদেশি জেলেদের জলসীমায় না ঢুকতে পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময়কাল সমন্বয় করতে হবে।

১১) যৌথ সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব জোরদার করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২) অবৈধ, ঘোষণাবিহীন এবং অনিয়ন্ত্রিত (আইইউইউ) মাছ ধরার ক্ষেত্রে নলেজ বিনিময়ের মাধ্যমে টেকসই চর্চা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য আঞ্চলিক টেকসইতা উন্নত করার লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

১৩) মৎস খাতে, বিশেষ করে সামুদ্রিক মৎস খাতে, দেশের মৎসজীবীদের সক্ষমতা উন্নয়নে অবিলম্বে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। মৎস আহরণে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকারি বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষুদ্র ও দরিদ্র মৎসজীবীদের বৈশ্বিক ভর্তুকি বিতর্কের বাইরে রাখা এবং তাদের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা উন্নয়নে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

১৪) যেহেতু ইলিশ মাছ প্রধানত নদীতে ধরা হয় এবং এটি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, তাই ডব্লিউটিও পর্যায়ে ইলিশ মাছকে সামুদ্রিক খাতে না দেখিয়ে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশকে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৫) ভিজিএসএসএফ-এর উপর জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (তাদের প্রথাগত ও মালিকানা অধিকারের সম্পর্কে জানানো এবং এই বিষয়গুলোতে তাদের মনোযোগ তৈরি করতে হবে)।

১৬) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান করতে হবে, যারা মোট মৎস্যজীবীদের ৯৩%। তাদের অধিকার, সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং মৎস্য সম্পদে প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

কোস্ট ফাউন্ডেশন, মেট্রো মেলোডি, বাড়ি-১৩, রোড-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: ০২ ২২৩৩১৪৭২৯, ০২ ৪১০২৫৮৮৯, ০২ ৪১০২৫৮৯০, ০২ ৪১০২৫৮৯২; ইমেইল: info@coastbd.net, www.coastbd.net